বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, মমতা ব্যানার্জি এবং বাংলাদেশ

ড. ফজলুল হক সৈকত

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে গেলে আজকাল প্রায়শই আমি একটি নাম উচ্চারণ করে থাকি। নামটি অনেকের কাছে অপরিচিত। তিনি অমিতাভ চাকমা অমিত। রাঙামাটির এই কৃতি সন্তান সুদূর কানাডার একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং প্রেসিডেন্ট। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন সেখানে (কানাডায়) একজন শিক্ষকের নিজ ডিসিপ্লিনে জ্ঞানের গভীরতা কিংবা জানার পরিসর এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ও কাজ সম্পাদনের যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ভাবলে অবাক লাগে, আমাদের দেশে দলীয় রাজনীতির তল্পিবাহকরাই ভিসি-প্রোভিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করে থাকেন। এসব পদে নিয়োগের জন্য তাঁদের অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার বিবেচনা করার কোনো কালচার বাংলাদেশে তৈরি হয়নি। এই প্রচলন এখন কলেজ-স্কুল পর্যন্ত গড়িয়েছে। আর আছে "বোঝার ওপর শাকের আঁটি"র মতো ছাত্ররাজনীতি (ছাত্ররাজনীতি শব্দটা কীভাবে যেন প্রচলিত হয়ে গেছে; তাতে ছাত্রীদের কথাটা বোধহয় বাদ পড়ে যায়- শিক্ষার্থী রাজনীতি বলতে পারলে ভালো লাগতো!) । অবশ্য এককালে ভারতে (এমনকি পরবর্তীকালের পূর্ব-পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও) ছাত্ররাজনীতির একটা আভিজাত্য ছিল। জাতীয় অনেক সংকট-নিরসনের আন্দোলন ও অর্জনে ছাত্রদের ভূমিকার কথা আমরা আজো ভুলতে পারি না। কিন্তু সময়ের পালাবদলে বর্তমান রাজনীতিতে এবং বিশেষ করে ছাত্ররাজনীতিতে পচন ধরেছে। আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর প্রভাবে লেখাপড়ার পরিবেশ ও মান বিঘ্নিত হয়েছে এবং হচ্ছে মারাত্মকভাবে। সেশনজট, মারামারি এবং হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়ংকর ও অমানবিক ঘটনারও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে আমাদেরকে ।

জাতীয় রাজনীতিতে তো আমরা মোটামুটিভাবে পরিবারকেন্দ্রিক রাজতন্ত্রের পথেই নিশ্চিত সমর্থন দিয়ে রেখেছি- বলা চলে। কাগজে-কলমে-ভাষণে গণতন্ত্রের কথা বললেও (কথাগুলো মুখরোচক বোধহয়; হয়তো শ্রুতিমধুরও) প্রকৃতঅর্থে আমরা ব্যক্তি আর দুটি পরিবারের ইচ্ছা-অভিমান-সিদ্ধান্ত-কৌশলের ওপর ছেড়ে দিয়েছি আমাদের রাষ্ট্রীয় রাজনীতি আর সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ইচ্ছিচারেক কপালের ভার (ওজন অর্থে) ও দায়িত্ব। একজন ব্যক্তি বারবার সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন; আজীবন দলের প্রধানের পদে অসীন থাকেছেন- এতে আমাদের যেন কোনো আপত্তি-অসুবিধা হচ্ছে না; তাদের পরিবারের লোকজন উত্তরাধিকারের মতো দলের ও সরকারের দায়িত্বে আসবেন এমন ব্যবস্থা আমরা প্রায় পাকাপোক্ত করে ফেলেছি বলেই ধরে নেওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কংগ্রেসের সভাপতি সোনিয়া গান্ধি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজে প্রধানমন্ত্রী হননি; পরিবারের অন্য সদস্যকেও ওই পদে মনোনয়ন দেননি- এভাবে তিনি গণতন্ত্রকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন; ত্যাগ স্বীকারের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি চালাচ্ছেন দল; আর সরকার পরিচালনা করছেন মনমোহন। দল আর সরকার এক কথা নয়; আর দুটো বড়ো ও ভারী দায়িত্ব একসাথে পালন করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়- একথা সোনিয়া জানেন। এরকমটা জানছে অ্যাকাডেমিক শিক্ষা বা ভিনদেশি প্রশিক্ষণের বা দাদাদের পরামর্শের প্রয়োজন পড়েনা; অনুভবজ্ঞান দ্বারা এর সত্যসত্য ও আলো অনুধাবন করা যায়! আমরা কিন্তু এখনও অতোটা উদার (এবং অংশত খানিকটা চৌকষও বললেও বেশি বলা হয় না) হতে পারিনি।

ভারতের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ব্যতিক্রমি ও উজ্জ্বল নাম। রাজনৈতিক চাটুকারিতায় তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সাথে আসার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত পানিবন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে একমত না হতে পেরে মমতা সে সফরে যোগ দেননি। তিস্তা চুক্তির খসড়াটা নাকি তাকে দেখানো হয়নি! তাইতো যে চুক্তির (আন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের) খসড়া তিনি দেখেননি, তাতে চোখবন্ধ করে, নেতাজি বা নেত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বাক্ষর করবেন মমতা- এমনটা আমরা কী করে আশা করি। কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক আর রাজনীতির বাতাবরণে কী একজন নেতা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির কার্যপরিধি পরিচালিত হতে পারে! না, তাতে জনগণের আশা-প্রত্যাশা, লাভ-ক্ষতির প্রশ্নাদি জড়িত থাকে। মমতারা সে দায়িত্ব এড়াতে পারে না! বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন নজির নেই; আশা করাও দুরাশারই সামিল। অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই মমতা ব্যানার্জি শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য এক বহুল প্রত্যাশিত ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আর তা হলো- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য আইন পাস করার প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং তা এখন বাস্তবায়নের পথে; বিষয়টি এখন কেবল সময়ের ব্যাপার

মাত্র। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায়-গবেষণায় মনোযোগী হবে- এমন চিন্তা থেকেই এই সিদ্ধান্তের পথে পা বাড়ানো! শিক্ষিত মানুষ হিসেবে সবাই রাজনীতি সচেতন থাকবেন, তাতে কারো কোনো আপত্তি থাকবার কথা নয়; কিন্তু পাঠদানের কিংবা পড়ালেখার কাজে ফাঁকি দিয়ে দলীয় রাজনীতির লেজুরবৃত্তি কিংবা জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা কোনোভাবেই শিক্ষার সার্বিক পরিসর ও পরিবেশের জন্য কাম্য হতে পারে না। এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে রাজ্যের সরকার প্রধান ও রাজনীতিবিদ মমতা ব্যানার্জি যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন এ জন্য তিনি অবশ্যই অভিনন্দন পাবার যোগ্য। জয়তু ব্যানার্জি! অভিবাদন মমতা!

আমরা সবেমাত্র একটি শিক্ষানীতি অনুমোদন করতে সমর্থ হয়েছি; এর বাস্তবায়নের পথে তিল তিল করে প্রবেশ করছি মাত্র। সারাদেশে বহুমুখি শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার মান-পরিবেশ ও খরচাদির অসমতা, শিক্ষক সংকট, গবেষণার প্রতি প্রবল অনীহা, আবাসন সুবিধার অপ্রতুলতা, প্রমোশনজট এবং সেশনজট, কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রকাশ্য ও অপ্রতিরোধ্য লেজুরবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে বেশ খারাপ সময় পার করছে। যদিও বাৎসরিক প্রতিবেদন কিংবা নামকাওয়াস্তে কিছু জরিপে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত ও অগ্রসর হয়েছে বলে দাবি করা হয়; সরকারের পক্ষ থেকেও শিক্ষায় অগ্রগতি লাভের কথা প্রচারমাধ্যমের মাধ্যমে জনগণকে মাঝে মাঝে জানানো হয়, তথাপি আমার মনে হয় সার্বিক বিচারে আমরা এখনও অনেকটা পিছিয়েই রয়েছি। কেবল ঘুরপাক খাচ্ছি কী করি আর কী না করির দোলায়! স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমের পারম্পর্য বিধান যে একটি জরুরি ব্যাপার, তা আমরা আজও অনুধাবন করে উঠতে পারিনি; অথবা উপলব্ধি করতে পারলেও সে অনুযায়ী বাস্তবভিত্তিক তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি। প্রতিদিন আমাদের ভার ও দায়িত্ব বাড়ছে; বৃদ্ধি পাচ্ছে জটিলতা। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তাজনিত কারণে মেধাবী ব্যক্তিরা শিক্ষকতায় আসতে আগ্রহ পাচ্ছেন না; নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে না সিনিয়র শিক্ষক। গবেষকের সংখ্যাও দিন দিন ভয়াবহ রকমভাবে কমছে। গত কিছুদিনের জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয়, কলাম এবং প্রতিবেদন থেকে এই সব বিষয় আমাদের নজরে এসেছে। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি তো আরো খারাপ। কয়েকটি হাতেগোনা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সবকয়টি হয় নির্ভর করছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর; নয়তো অযোগ্য ও অদক্ষ-অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পরিচালনা করছে পাঠ কার্যক্রম। অনেক প্রতিষ্ঠানে নেই প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি বা সেমিনার কক্ষও। অবসরে বিচরণের ক্ষেত্রতো নেই অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের- একটি বা একাধিক ভিন্ন ভিন্ন ভবনে পাঠদানের কাজ চলছে বটে; কিন্তু শিক্ষার্থীদের অবসর বা অপেক্ষার সময়গুলো কাটাতে হয় ভবনের সিঁড়িতে অথবা সামনের রাস্তায় বসে বা দাঁড়িয়ে!

বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রাজনীতি তার অতীত ঐতিহ্য হারিয়েছে আরো অনেক আগেই। ভাবলে কষ্ট লাগে, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড জাতীয় খেতাব ভুলে আমরা এখন লেখাপড়াকে খেলো বিষয় বানিয়ে ছেড়েছি! এখন বিদ্যার্জন বিষয়কে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক দলাদলি নিয়ে ক্যাম্পাসগুলো অস্থির। দলীয় মিছিল-মহড়া আর দাপটের কাছে সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বর্তমানে অসহায় বলির পাঠা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন! দেশময় চলছে বেহাল অবস্থা। লাগামহীনভাবে বাড়ছে সংকট আর সমস্যা; প্রতিকারের ব্যবস্থা যে অত্যন্ত অপ্রতুল, তা সরেজমিনে গেলে টের পাওয়া যায়। স্কুল আছে তো মাস্টার নেই; শিক্ষার্থী রয়েছে তো বসবার বেঞ্চ নেই; কলেজ আছে শিক্ষার্থী নেই: বিশ্ববিদ্যালয় আছে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব; ক্লাস আছে রুটির নেই কিংবা রুটিন আছে ক্লাস হয় না;- এভাবে জোড়াতালি দিয়ে কোনো রকমে শিক্ষা নামক প্রায় অচল গাড়ি গায়ের জোরে আর বক্তব্যের তোড়ে চালানো হচ্ছে! শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ এখন আর তেমন একটা চোখে পড়ে না। আর সবচেয়ে মুশকিল হলো- এখানে এখন এসব ব্যাপার দেখার কেউ নাই! বিশ্ববিদ্যালয়ের এমনকি কলেজ-স্কুলের কর্তাব্যক্তিরা রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সরাসরি আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ায়, নানান রকম আশ্রয়-প্রশ্রয়ে পড়ে, পরিবেশ দিনদিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একটা বড়ো অংশ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় ক্লাস নিতে বা করতে তাদের অনীহা; গায়ের জোরে বা ক্ষমতার জোরে সব কাজ সারতে চান যেন তারা। স্বাধীনতা অর্জনের (লাভের নয় কিন্তু!) ৪০ বছর পরেও আমরা শিক্ষার প্রার্থিত অধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পাইনি- সত্যিকার অর্থেই!

একথা মনে রাখা দরকার শিক্ষার মুক্তি না হলে জাতির কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথে কেন দ্বারপ্রান্তেও আমরা পৌঁছুতে পারবো না। আর জাতিকে শিক্ষার আলো প্রদান করতে হলে ক্যাম্পাস থেকে দলীয় রাজনীতির লেজুরবৃত্তি অনতিবিলম্বে দুর করতে হবে। অবশ্য প্রয়োজনে নির্দলীয় শিক্ষক কল্যাণ পরিষদ এবং শিক্ষার্থী কল্যাণ পরিষদ থাকতে পারে; এই পরিষদগুলো কেবল নিজেদের অধিকার, মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে– সারা দুনিয়ার ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা (বিশেষত আমাদের কর্তাব্যক্তিরা) এত বিদেশভ্রমণ করি, তো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সেরা সেরা সব বিদ্যাপীঠের কাঠামোগুলো দেখে তো কিছুটা ধারণা ও শিক্ষা নিতে পারি! জানি না, সে পরিবেশ ও সময় আমাদের বাড়ির উঠানে (জাতির ভাগ্যাকাশও বলা চলে) কবে হাজিরা দেবে!

ভারত আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও ঘনিষ্ট (ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে) রাষ্ট্র। বর্তমান সরকার বা ক্ষমতাসীন (নাকি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত) দল-জোটের সাথে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো বলেও শোনা যায়; আর তাই, ঐতিহাসিক ও বন্ধুত্বপুর্ণ এই সম্পর্ককে আমরা পারস্পরিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারি। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অনুসরণীয় নীতিমালা বা পদ্ধতি কিংবা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকেও নিতে পারি প্রয়োজনীয় পাঠ অথবা দরকারি সহযোগিতা। অন্তত বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক প্রভাব এবং তৎজনিত জমেওঠা সেশনজটের ছোবল ও কবল থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই রাজনৈতিক ছায়ামুক্ত করা প্রয়োজন। লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি এবং গবেষণা-প্রকাশনার দিকে নজর বাড়াতে হবে। আন্তর্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ গ্রহণ ও ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যের কাছ থেকে ভালোটা শিখলে দোষ কী? মমতা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন– এরকমটা আমরা নিতে পারি কি না, একবার ভেবে দেখলেও তো চলে!

ড. ফজলুল হক সৈকত

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কবি-কথানির্মাতা-প্রাবন্ধিক; রেডিও সংবাদ পাঠক; কলামলেখক।

(সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
এবং সাবেক আহ্বায়ক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর)

ই-মেইল: snue90@yahoo.com, fsaikat26@gmail.com
ফোন: ০১৮২৪৫১৬০৮৮

ড. ফজলুল হক সৈকতের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন